মত-মতান্তর

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ | প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা | বিনিময় ঃ ১০ টাকা

সম্পাদকীয়

পনেরটি প্রবন্ধ নিয়ে মত-মতান্তরের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। এবারের বিষয় শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি। বিগত সংখ্যাগুলির বিষয়ে পাঠক পাঠিকাদের আগ্রহ আমাদের উৎসাহিত করেছে ক্ষীণতনু পত্রিকাটির কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি করতে। প্রাবন্ধিকরা সবাই প্রায় আপনাদের পরিচিত এবং নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। যে তিনটি মূল বিষয়কে নির্বাচন করা হয়েছে, তা আমাদের মতে, পরস্পরের থেকে অবিভাজ্য এবং পরিপূরকও বটে। প্রবন্ধগুলি পাঠকদের চিন্তার এবং আলোচনার উপাদান হিসাবে বিবেচিত হলে আমরা সফল বলে মনে করব। একটি স্মৃতিকথন যুক্ত হয়েছে এই সংখ্যায়। প্রিয় সাহিত্যিক, কবি ও গণ আন্দোলনের সাথী প্রয়াত নবারুণ ভট্টাচার্যকে স্মরণ করে।

মত-মতান্তর "ফ্রেন্ডস অব ডেমোক্রাসির" দ্বারা প্রকাশিত হলেও লেখকদের অনেকেই আমাদের সংগঠন বহির্ভূত বন্ধু ও সাথী। আমরা বিশ্বাস করি বহুস্বরে, পর্যালোচনায়, চিন্তন অনুশীলন করায়। প্রতি বৃহস্পতিবার মহাত্মা গান্ধী রোড / কলেজ স্ট্রীট-এর প্রায় সংযোগস্থলে ঘোষ কেবিনের দ্বিতলে সাপ্তাহিক বৈঠকে বন্ধু-অবন্ধু সবাই তাই স্বাগত। মত-মতান্তর যাতে মন-মনান্তরে পরিণত না হয়, সেজন্য সমস্ত আলোচনাকে সযত্নে লালন করাই আমাদের কর্মপ্রণালী।

যথারীতি দেশ চলেছে তীব্র আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জম্মু কাশ্মীরের বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। "মারের সাগর ভীষণ ঝড়ের বায়ে" পাড়ি দেবার অসম স্পর্ধায় আপনিও আমাদের সাথী হোন — এই আবেদন আবার রাখলাম।

আধুনিক ডাক্তার ঃ মুক্তচিন্তার দাবি

স্থবির দাশগুপ্ত

ডাক্তারদের আজকাল হিপোক্রোটিস-এর দিব্যি কাটতে হয় না ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কাছে জনমানুষের প্রত্যাশাগুলো থেকেই যায়। যেমন, ডাক্তাররা অসুস্থ মানুষের পাশে থাকবেন, রোগ সারুক বা না-সারুক রোগীর কোনো অপূরণীয় ক্ষতি না হয়ে যায় তা তাঁরা দেখবেন। ডাক্তারকে তাঁরা প্রাণের প্রহরী হিসেবেই দেখতে চান। কিন্তু তেমন সদ্যজাগ্রত প্রহরী কি সত্যিই হওয়া যায় ? ডাক্তাররা নিজেদেরকে বিজ্ঞানের সেবাদাস হিসেবে ভাবতে চান। কিন্তু তাঁরা কি সত্যিই তাই ? ডাক্তার আসলে কার স্বার্থ রক্ষা করেন ? নবীন ডাক্তাররা কার স্বার্থ রক্ষা করবেন ?

আধুনিক ডাক্তারি যার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলে তা হল রাষ্ট্র জনজীবনের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, — স্বাস্থ্যও। স্বাস্থ্যকে সে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তার সঙ্গে অর্থনীতি আর রাজনীতির সামঞ্জস্য থাকে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে ডাক্তার সেই নিয়ন্ত্রণের ব্যাকরণ তৈরি করেন, তাকে বলবৎ করেন। বিয়ের বয়স, ধর্ষণের সংজ্ঞা, গর্ভপাত বেআইনি হবে কিনা, স্বাস্থ্য বা সুস্থতা কাকে বলে, কোন রোগের প্রতিরোধে কী কী অবশ্যকর্তব্য আর কী কী অকর্তব্য, স্বেচ্ছামৃত্যু বৈধ হবে কিনা, এইসব গুরুতর বিষয়ে তাঁদের ভূমিকা গ্রাহ্য হবে, — রাষ্ট্র যেমন চায় তেমনভাবে। তাহলে বলতেই হয় যে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কাজ করেন ডাক্তার হিসেবে তাঁদের তেমন কোনো স্বাধীনতা নেই। প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত গবেষকদের অবস্থানও একই। গবেষণায় তাঁরা নিজেরা যে উপকৃত হবেন তা নিশ্চিত। তবে তাতে জনমানুষ উপকৃত হবেন কিনা তা অনিশ্চিত। গবেষণার ফল যদি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে যে কী হবে তা আরো অনিশ্চিত।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ চিকিৎসা পরিষেবা ও সরকারী নীতি

পুণ্যব্রত গুণ

স্বাস্থ্য মানে কেবল চিকিৎসা-পরিষেবা নয়, কিন্তু রোগীর চিকিৎসা করে এমন একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসা-পরিষেবা, বিশেষত সরকারী চিকিৎসা পরিষেবাতেই আমার আলোচনা সীমিত রাখব।

২০১১-এ নতুন সরকার গঠনের পর থেকে স্বাস্থ্য দফতরের পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর হাতে, তাই সরকারী নীতি-নির্ধারণে স্বাস্থ্য যথেষ্ট গুরুত্ব পাবে, এমনটাই আশা করা যায়।

- ২০১১-র ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারী ডাক্তারদের জেনেরিক নামে ওষুধ লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে জেনেরিক প্রেসক্রিপশন শুরু করা হয় কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।
- নবজাতক শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য ডাঃ ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়।
- আরেকটা উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয় দ্বিতীয় স্তরের হাসপাতালগুলোর উন্নয়নের জন্য, এর নেতৃতেব আছেন ডাঃ সুব্রত মৈত্র।
- ২০১১-র আগে সিক নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট ছিল ৬টা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৪০টা, এ বছরের শেষে সেই সংখ্যা ৫০-এ পৌঁছনোর কথা।
- এছাড়া বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে সিক নিওনেটাল স্টেবিলাইজিং ইউনিট স্থাপিত হয়েছে ১২৭টা। এ বছরের শেষে আরও ১৭৩টা ইউনিট স্থাপিত হওয়ার কথা।
- ১১-ই ডিসেম্বর, ২০১২ থেকে আগষ্ট ২০১৩-র মধ্যে ৩৫টা সরকারী হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধ দোকান স্থাপিত হয়েছে, যেগুলো থেকে রোগীরা ১৪২টা অত্যাবশ্যক ওষুধ ৪৮% থেকে ৬৭.২৫% কম দামে কিনতে পারেন। তাছাড়াও এসব দোকানে পাওয়া যায় অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিতে ব্যবহার্য স্টেন্ট, পেস-মেকার, অস্থিচিকিৎসায় ব্যবহার্য ইমপ্ল্যান্ট, ইত্যাদি। আরও ৮৬টা সরকারী হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- এর পাশাপাশি আছে ন্যায্য মূল্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা। ৮৪টা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় প্যাথোলজিকাল পরীক্ষা ও এক্সরের ব্যবস্থা হয়েছে পিপিপি মডেলে। ২২টা সিটি স্ক্যান মেশিন ও ৮টা এমআরআই মেশিন বসেছে।
- যে সব হাসপাতালে ব্যবস্থা নেই, সে সব কিছু সরকারী হাসপাতালে ডিজিটাল এক্সরে, সিটি স্ক্যান ও এমআরআই মেশিন বসানো হবে। ডায়ালিসিস-এর ব্যবস্থা করা হবে। সরকার মেশিন কিনবে, পরিচালনা করবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।
- মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৭, সিটের সংখ্যা ২২০০।
- ৭টা নূতন স্বাস্থ্য জেলা হয়েছে—বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম, নন্দীগ্রাম, ডায়মন্ড হারবার, আসানসোল, রামপুরহাট ও বসিরহাট।
- জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোকে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনার অন্তর্গত করা হয়েছে। ১৩টা জেলা হাসপাতাল, ৫টা মেডিকেল কলেজ ও ২টো মহকুমা হাসপাতালে এই পরিষেবা এখন পাওয়া যাচ্ছে।
- ২০১৪-র ৯ই জানুয়ারী জারী হওয়া এক সরকারী মেমোরান্ডামে বলা হয়েছে যে সরকারী হাসপাতালে আউটডোর ও ইন্ডোরের ফ্রি বেডগুলোতে বিনামূল্যে অত্যাবশক ওষুধ সরবরাহ করা হবে। সরকারী ওষুধের তালিকায় জীবনদায়ী ওষুধের সংখ্যা ৪৮, অত্যাবশ্যক ক / ৬৭, অত্যাবশ্যক খ / ৬৮ এবং অত্যাবশ্যক গ / ৫৬টা।
- ৩রা মার্চ, ২০১৪-এ জারী হওয়া এক আদেশে বলা হয়েছে এখন থেকে সরকারী হাসপাতালে ডাক্তারের লেখা ওষুধের পুরো কোর্স পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাস্তবটা ঠিক কি রকম ?

- গ্রাম ও শহরের স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিরাট বৈষম্য। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ থাকেন, সেখানে পাশকরা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের

চিকিৎসক ১৩১১৭ জন, অথচ শহরাঞ্চলে ডাক্তারের সংখ্যা ৩৯৩৪৯ জন। আসলে কিন্তু গ্রামে আরও কম সংখ্যক ডাক্তারকে পাওয়া যায়, গ্রামের সরকারী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাঁদের পোস্টিং তাঁদের অনেকেই সপ্তাহে ২-৩ দিন গ্রামে থাকেন, বাকী দিন শহরে। গ্রামের হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ১৬,৮৬২, শহরে ৯২,১০০।

- চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন।

- জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও অধিকাংশ ওষুধ জেনেরিক নামে পাওয়া যায় না। রোগী কোন ব্র্যান্ডের ওষুধ পাবেন তা জেনেরিক প্রেসক্রিপশনে নির্ভর করে ওষুধের দোকানীর ওপর, দোকানীর যে ব্র্যান্ডে লাভ বেশী সাধারণত সেই ব্র্যান্ড পান রোগী।

- শিশুমৃত্যু কমানোর জন্য এসএনসিইউ ভালো হাতিয়ার হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলোতে ডাক্তার নার্স বাড়ন্ত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকাঠামো পর্যাপ্ত নয়।

- ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, ন্যায্য মূল্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা—প্যাথোলজি, রেডিওলোজি, ডিজিটাল এক্সরে , সিটি স্ক্যান এবং ন্যায্যমূল্যে ডায়ালিসিস পরিষেবা, এই সবগুলোই প্রাইভেট-পাব্লিক পার্টনারশিপ অর্থাৎ সরকারী পরিকাঠামো ব্যবহার করে স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের মুনাফা লোটা। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য যোজনা কমিশনের উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ কিন্তু পিপিপি-র বিরুদ্ধে।

- ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানগুলোর ইতিবাচক প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে—এইগুলোর চাপে পশ্চিমবঙ্গের ওষুধের দোকানিদের সংগঠন বিসিডিএ (বেঙ্গল কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্টস এসোসিয়েসন) বাধ্য হয়েছে এমআরপি-র চেয়ে কমে ওষুধ বিক্রি করতে। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিতে ব্যবহার্য স্টেন্ট, হার্টব্লকে ব্যবহার্য পেসমেকার-এর দাম প্রায় কুড়ি হাজার টাকা করে কমে গেছে, অসাধু ডাক্তারদের কমিশন খাওয়া কমেছে। কিন্তু ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের বিরুদ্ধেও বলার আছে—যে ১৪২টা অত্যাবশ্যক ওষুধের কথা বলা হয়েছে, আসলে কিন্তু ওষুধের সংখ্যা ১৩৩টা, বাকী ৯টার পুনরাবৃত্তি আছে। এই কটার মধ্যেও আবার একই ওষুধের বিভিন্ন রূপ আলাদা আলাদা তালিকাভুক্ত হয়েছে, ব্যাপারটা এরকম—অ্যামোক্সিলিন-এর ৫০০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল, ২৫০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল, ১২৫ মিলিগ্রাম বড়ি ও সিরাপ — মোট ৪ বার তালিকাভুক্ত হয়েছে অ্যামোক্সিলিন। তালিকা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি আসলে কাজের ওষুধের সংখ্যা ৯০টা। এই ৯০টা ওষুধের মধ্যে আবার ৬৮টাই কেবল ভারতের জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকাভুক্ত। জাতীয় তালিকায় ওষুধের সংখ্যা ৩৪৮টা।

- নতুন মেডিকেল কলেজের কিছু বেসরকারী। সরকারী মেডিকেল কলেজ সাড়ে ৪ বছর ডাক্তারী পড়তে খরচ হয় ৪০,৫০০ টাকা। বেসরকারী কলেজে জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ভর্তি হলে প্রায় ৫ লাখ, কলেজের প্রবেশিকা দিয়ে ভর্তি হলে প্রায় ২২ লাখ, এনআরআই কোটায় ৫৫ লাখ—অর্থাৎ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পেছনে মুনাফাই প্রধান উদ্দেশ্য। সরকারী মেডিকেল কলেজের সিট বাড়ানো হলেও লেকচার, থিয়েটার, ল্যাবরেটরী, হস্টেল, শিক্ষক কোন কিছুই বাড়ানো হয়নি। নতুন সরকারী মেডিকেল কলেজ খোলা হয়েছে পরিকাঠামো না বানিয়েই।

- মেডিকেল পাঠক্রমে কোনও বড় রকম পরিবর্তন হয়নি। প্রান্তিক মানুষজনের স্বাস্থ্যসমস্যা সেখানে গুরুত্ব পায় না। যেমন ২০১২-র সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৩০৩৫ জন সাপের কামড় খান, মারা যান ৩২৮ জন। অথচ ডাক্তারদের সর্পদংশনে এভিএস চিকিৎসা শেখানো হয় না। পেশাগত রোগগুলো যথাযোগ্য স্থান পায় না পাঠক্রমে। এমন কি নতুন মেডিকেল স্নাতকরা অনেকেই পেটের অসুখ বা সর্দিকাশির মতো সাধারণ রোগগুলোর চিকিৎসায় দক্ষ নন।

- রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা দিয়ে গরীব মানুষের চিকিৎসার একটা চেষ্টা চলছে। কিন্তু অনেক গরীব মানুষই এখনও RSBY কার্ড পাননি। এই যোজনা

নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও প্রচুর। কার্ড পুনর্নবীকরণের জন্য টাকা লাগে না, অথচ বহু ক্ষেত্রে টাকা নেওয়া হচ্ছে। বীমায় যে সব প্যাকেজ আছে, সেই প্যাকেজে চিকিৎসা করে কার্ড থেকে টাকা কাটার পর অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে রোগীর কাছ থেকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বীমার টাকা পেতে বেসরকারী হাসপাতাল নার্সিংহোমের ডাক্তাররা প্রয়োজন ছাড়াই মহিলাদের হিস্টেরেক্টমি অপারেশন করে দিচ্ছেন। সরকারী হাসপাতালে RSBY কার্ডের সুবিধা পেতে গেলে সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুমতি নিতে হয়, অনুমতিপত্রে সই করানোর জন্য দালাল আছে।

বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়ার ৯ই জানুয়ারী, ২০১৪-র মেমোরান্ডাম ও পুরো কোর্সের ওষুধ দেওয়ার ৩রা মার্চ, ২০১৪-র আদেশ অনেক সরকারী হাসপাতালে পৌঁছায় নি বলে নদীয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বন্ধু সংগঠনগুলো জানিয়েছেন।

৯ই জানুয়ারীর মেমোরান্ডামে প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি (Standard Treatment Guidelines)-র কথা বলা হয়েছে। এমন বিধি তৈরী আছে কেবল প্রাথমিক স্তরের চিকিৎসার জন্য, তাও তা বহুল প্রচারিত নয়।

চিকিৎসা পরিষেবার সমস্যাগুলো অনেক গভীরে, ছোটখাট সংস্কারে কিছুর হওয়ার নয়। চাই সবার জন্য স্বাস্থ্য, রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নেবে এমন একটা ব্যবস্থা। সেখানে সমস্ত ডাক্তার হবেন রাষ্ট্রের নিযুক্ত, আপনার রোগ হলে কোন ডাক্তারের কাছে যাবেন তা হবে পূর্ব-নির্ধারিত, তিনি ওষুধ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা লিখবেন প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি মেনে, কোন বিশেষজ্ঞের কাছে বা হাসপাতালে ভর্তির জন্য তিনি পাঠাবেন তাও পূর্ব-নির্ধারিত, কোনও ধাপেই আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। কর থেকে সংগৃহীত অর্থে চলবে সমস্ত চিকিৎসা-পরিষেবা। অর্থাৎ স্বাস্থ্য-পরিষেবার রাষ্ট্রীয়করণ চাই।

শিক্ষকের মূল্যায়ন ! সব্বোনাশ !

মালবিকা মিত্র

অফিস ফেরত সঞ্জীব আগে বন্ধুদের সাথে আড্ডা গুলতানী যতক্ষণ সম্ভব চালায়; তারপর হাতে যখন আর সময় নেই, তাড়াহুড়ো করে চলে বাড়ির পথে। ওঃহো, ছটা গরম রুটি নিতে হবে দোকান থেকে। 'বাসন্তিদি, তাড়াতাড়ি সময় নেই'। বললেই হবে, তখন বাসন্তিদিরও সময় নেই, প্রাইম টাইম, কত মানুষ দাঁড়িয়ে, অগত্য সঞ্জীব ছটা লেচি চেয়ে নিল 'কোনো সমস্যা নেই, এতেই চলবে।' রুটির দাম দেয় সঞ্জীব। মাঝে মধ্যেই এই এপিসোডের রিপিট টেলিকাস্ট হয়। বাসন্তিদির লজ্জা করে, রোজ রোজ লেচি দিয়ে রুটির দাম নিতে। অতঃপর দিদি একটা ক্যাসারল এনে সময় থাকতেই সঞ্জীবের জন্য ছটা / আটটা রুটি সরিয়ে রাখে। কারণ বাসন্তিদির লজ্জা করে। দিদি নিজেই লজ্জা পায়, নাকি সঞ্জীব লজ্জা দেয় ? বুঝতে পারিনি ঠিক।

প্রশান্ত সকাল থেকে প্রাইভেট টিউশন, ঘরের কাজ সাঙ্গ করে যখন স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ঘড়িতে তখন বেলা এগারোটা। বাড়ি থেকে স্কুল আড়াই কিলোমিটার। অটো পেয়ে পৌঁছতে মিনিট পঁচিশ / ত্রিশ। প্রথম পিরিয়ডে প্রশান্ত শুধু নাম ডাকে। নতুন হেডমাষ্টার এসেছেন অজয়বাবু। প্রশান্ত যখন এগারোটা পঁচিশে ক্লাসে গেল, দেখলো অজয়বাবু ক্লাস নিচ্ছেন, 'আজ ক্লাসটা আমিই নিচ্ছি, ফাঁকা ছিল ক্লাস, হট্টগোল চলছিল'— হেড মাষ্টারমশাইর সংযত শাসন। পরদিন প্রশান্ত স্কুলে এলো এগারোটা চল্লিশে। 'ভালই হয়েছে, আজও হেডস্যার ক্লাস নিচ্ছেন।' জানলাম, লজ্জা দেওয়া যায় না, লজ্জা পেতে হয়। একবার লজ্জাকে জয় করতে পারলে কেউ লজ্জা দিতে পারবে না। যাকে বলে নির্লজ্জ হওয়া।

কতটা নির্লজ্জ হলাম শুনবেন ? বলি তাহলে। স্কুলে সরস্বতী পুজোর খাওয়া-দাওয়া হবে। ক্যাটারার করলো কি, খুব অল্প 'এ' গ্রেড খাবার বানাল; এক নৌকা ফ্রায়েড রাইস প্রচুর কাজু, কিসমিস, ঘি, মশলা দিয়ে, বড় এক গামলা পনির, চাটনী ইত্যাদি। 'স্যার, ম্যাডাম, আপনারা খেয়ে নিন। ঠান্ডা হলে ভালো লাগবে না খেতে।' স্পেশাল খাবার সবাই খেল, বাড়ির যারা এসেছিল তারাও, কেউ বাড়ি নিয়ে গেল ! এটা স্পেশাল ব্যবস্থা। প্রাইভেট। পাবলিক বন্দোবস্তটা কেমন ? শুধুই রাইস; কাজু, কিসমিস, বিনস, গাজর, ঘিয়ের হালকা কোমল আলতো ছোঁয়া। স্যার ম্যাডামের তদ্‌বির